তৃতীয় অধ্যায়

বরাক উপত্যকার ভাষা আন্দোলনের চলমান প্রক্রিয়া ও ভাষা আগ্রাসন

জাতীয়তায় রূপান্তর লাভ মানুষের বিকাশের একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। জনজাতি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলো কোথাও বা কখনো শ্রেণিবদ্ধ এবং সংঘাত, সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে জাতিতে রূপান্তরিত হয়। আবার কোথা কোথাও বা কখনো কখনো 'melting together' বা দ্রবণ ও সংমিশ্রণ এবং সমীভবনের প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। প্রাচ্যে তথা ভারতে এবং বিশেষ করে বঙ্গ ও আসামে দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি কার্যকরী হয়েছে। আসাম যখন কামরূপ নামে পরিচিত ছিল তখন থেকেই এখানে নানা জনগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে আসছেন। ধীরে ধীরে ককেশিয় জনগোষ্ঠীর লোকেরাই তাদের সংস্কৃতির উৎকর্ষের সুবাদে এখানে প্রাধান্য লাভ করতে শুরু করে এবং তাদেরই প্রভাবে অসমিয়া ভাষা ও জাতিগঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়।[১] অসমিয়া ভাষার শব্দ ভাণ্ডারের দিকে লক্ষ রাখলে দেখা যায় যে তদ্ভব শব্দের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। তারপরই স্থানীয় বিভিন্ন জনজাতীর ভাষার শব্দের ভাণ্ডার। অনার্য ভাষায় শব্দাবলির মধ্যে অষ্ট্রিক ভাষা পরিবার এবং চিন-তিব্বতীয় ভাষা পরিবারের শব্দই প্রধান। বিজ্ঞান সম্মত অধ্যয়ন না হলেও ড. বাণীকান্ত কাকতি খাসি, কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল, মালয় ভাষা এবং চিন-তিব্বতীয় ভাষা পরিবারের তাই ও তিব্বত-বর্মীয় শাখার বড়ো উপশাখার ভাষায় বেশ কিছু শব্দের সঙ্গে অসমিয়া শব্দের মিল দেখিয়েছেন।[২] অনেকগুলো স্থান ও অধিকাংশ নদীর নাম প্রধান প্রধান অনার্য ভাষা থেকে এসেছে বলে মন্তব্য করেছেন ড. কাকতি। এ সমস্ত ভাষার শব্দ বাদ দিলে শুধু আর্যমূল শব্দ দিয়ে অসমিয়া ভাষার টিকে থাকাট সম্ভব হতো না। সুতরাং অসমিয়া জাতি যে বিভিন্ন এথনিক জনগোষ্ঠী ও জনজাতির

সংমিশ্রণের বা দ্রবীভবনের ফলশ্রুতি, তা তাদের দৈহিক গঠনে যেমন, তেমনি তাদের ভাষা এবং সংস্কৃতিতে ও সুস্পষ্ট।

১৮২৬ সালে ইয়াণ্ডাবুর সন্ধির দ্বারা আসাম ব্রিটিশ অধীনে চলে যায়।[৩] ১৮৮১ সালে যে লোক গণনা হয়, তাতে দেখা যায় আসামের মোট জনসংখ্যা ২২,৪৯,১৮৬ জন। ওই সংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ ৮,৭৫,২৩৩ জন বড়ো-কাছাড়ি। মুসলিমদের সংখ্যা ৯.৩ অর্থাৎ ২,০৬,৪১৩জন। একমাত্র অব্রাহ্মণ বর্ণ হিন্দু অসমিয়া যাদের প্রাথমিক আর্য উপনিবেশ বলা হয়ে থাকে। সেই কলিতাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১০.৭ শতাংশ, আর ব্রাহ্মণ ছিলেন মাত্র ৬৮,৭৮৪ জন। এই ব্রাহ্মণদেরও আবার অনেকেই ছিলেন বাঙালি। রাজবংশীদের সংখ্যা ছিল ৩,৩৬,৭৩৯ জন।[৪]

১৮৭৪ সালে আসামের সঙ্গে কাছাড় জেলা (পুরাতন রাজ্য), গোয়ালপাড়া এবং পূর্ববঙ্গের সিলেট বা শ্রীহট্টে জেলা সংযুক্ত করে নেওয়া হয়েছিল।[৫] একমাত্র গোয়ালপাড়া ছাড়া বাকি দু'টো জেলাতেই বাঙালিরা ছিল সংখ্যা গরিষ্ঠ। গোয়ালপাড়াতে রাজবংশীদের প্রাধান্য অসমিয়া ভাষার মধ্যেই আরেকটা সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যযুক্ত উপভাষার জন্ম দিয়েছিল, যার অবস্থান ছিল বাংলা ও অসমিয়া ভাষার মাঝামাঝি।[৬]

১৮২৬ সালে ইংরেজদের প্রশাসনে সহায়তার জন্য অনেক বাঙালিকে আনা হয়, কারণ অসমিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষায় পশ্চাত পদতার দরুণ তখনো একাজের যোগ্য যথেষ্ট লোকের অভাব ছিল।[৭] অসমিয়ারা ও প্রথম প্রথম আধুনিক শিক্ষা লাভ করতেন কলকাতা গিয়ে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের তারা তখন মুগ্ধ পাঠক ছিলেন। হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন, মণিরাম বড় বন্দর বরুয়া, প্রমুখ মনীষী বাংলা ভাষায় উপহার দিয়েছেন তাদের অনেক রচনা।[৮] যদিও ১৮৩৮ সাল থেকে ১৮৭৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত আসামের শিক্ষার মাধ্যম ছিল বাংলা, যা ব্রিটিশ শিক্ষাবিদরাই প্রচলন করেছিলেন, তবু সে সময় অসমিয়া ও বাঙালিদের মধ্যে প্রীতি ও সৌহর্দ্যের সম্পর্ক ছিল। ধীরে ধীরে মিশনারি ও অসমিয়া পণ্ডিতদের প্রচেষ্টায় অসমিয়া ভাষা উপযুক্ত হয়ে উঠলে

বাংলাকে সরিয়ে অসমিয়াকেই করা হয় শিক্ষার মাধ্যম।[৯] এই সময়েই বঙ্গবাসী শ্রীহট্ট ও কাছাড় আসামের অন্তর্ভুক্ত হয়। অসমিয়াদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বাঙালি বিদ্বেষ-যাতে ব্রিটিশদের অবদানও ছিল।[১০] আত্ম প্রকাশের সুযোগ পেল এই দু'টো জেলাকে কেন্দ্র করে।

শ্রীহট্ট ও কাছাড়কে আসামের সঙ্গে যুক্ত করার পর থেকেই যে অসমিয়া উগ্র জাতীয়তাবাদীদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে যায়, যা আমরা আগে আলোচনা করেছি। সুরমা উপত্যকা নামে পরিচিত এই অঞ্চলের স্বার্থ হানিকর, তথা অপমানকর কথাবার্তা শুরু হয়। ১৮৮১ সালে স্যার অ্যাডোয়ার্ড গেইট সম্পাদিত আদমসুমারির রিপোর্টেও ১৯০৯ সালের 'Imperial Gazette'–এই অঞ্চলের বাঙালিদের ভাষা ও জাতিগত পরিচয় প্রসঙ্গে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়।[১১] প্রখ্যাত অসমিয়া পণ্ডিত বেণুধর রাজখোয়া ১৯০৩ সালে 'Notes on the Sylheti Dialect' নামে বই প্রকাশ করে এই সত্য প্রতিপালনে প্রয়াসী হন যে, শ্রীহট্ট-কাছাড়ে প্রচিলত বাংলা ভাষা আসলে অসমিয়া ভাষারই উপভাষা মাত্র।[১২] এই সব আক্রমণ ও অসত্য প্রচারের প্রতিবাদে এবং সুরমা উপত্যকার বাঙালির আত্মপরিচয়কে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে গঠিত হয় 'সুরমা উপত্যকা সাহিত্য সম্মিলনী'। এই সংগঠনের ১৯১৬ সালে অধিবেশনের সভাপতি ভুবনমোহন দেববর্মা তার অতিমূল্যবান সুদীর্ঘ তথ্যবহুল অভিভাষণে যেভাবে উগ্রজাতীয়তাবাদী অসমিয়াদের কূটতর্ক সমূহের উত্তর দেন, তা এক ইতিহাস। অভিভাষণটি একধারে সাহিত্য, ভাষা বিজ্ঞানে ও আত্মপরিচয়ের পক্ষে পেশ করা যুক্তির একটি অমূল্য দলিল। কিন্তু কূটতর্কে অন্ত হয় নি। আগ্রাসনেরও শেষ নেই। ১৯৮৯ সালে হাইলাকান্দিতে অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভার অধিবেশনেও নির্লজ্জভাবে উত্থাপন করা হয়েছিল সেইসব পুরাতন ভিত্তিহীন যুক্তি। আর বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের পক্ষ থেকে ড. সুজিৎ চৌধুরী 'সত্য ও তথ্য' পুস্তিকা লিখে তার জবাব দিয়েছিলেন।[১৩]

যা হোক, দেশ ভাগ এবং শ্রীহট্টের গণভোটের পূর্ব পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা

বনাম সুরমা উপত্যকা, অন্যভাবে বলতে গেলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অসমিয়া নেতৃবৃন্দ বনাম সুরমা উপত্যকার বাঙালি নেতৃবৃন্দের মধ্যে আসামের উন্নয়নমূলক অনেকগুলো প্রকল্প নিয়ে টানাপোড়েন চলতেই থাকে। অসমিয়ারা চাইতেন নিজেদের স্বার্থ আদায় করতে মেডিক্যাল কলেজ, হাইকোর্ট ইত্যাদি আসামে প্রতিষ্ঠা করতে, সুরমা উপত্যকার নেতারা এই দু'য়েরই বিরুদ্ধে ছিলেন। তারা বলতেন কলকাতা হাইকোর্ট তাদের জন্য যথেষ্ট। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থাকতে আসামে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের তারা পক্ষপাতী ছিলেন না।[১৪] ডিব্রুগড়ে বেরী হোয়াইট মেডিক্যাল স্কুলকে তারা চাইতেন না। তারা চাইতেন সিলেটে আগে মেডিক্যাল কলেজ হোক। অন্যদিকে অসমিয়ারা এমনকী ছাত্রদের বৃত্তিদানের সময়েও বৈষম্য করতেন। এরকম অস্বস্তিকর পরিস্থিতির ফলে অসমিয়ারা মনে করতেন যে, সিলেট তার 'Junior Partner' কাছাড়ের আসাম থেকে বেরিয়ে যাওয়াই ভালো। সুরমা উপত্যকার বাঙালিরাও মোটামুটি এরকমই ভাবতেন যে বঙ্গের সঙ্গে সংযুক্তিই তাদের এই অস্বস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে। উল্লেখ করা দরকার যে, রাজনীতিবিদরা যাই বলুন, অসমিয়া হিন্দু-মুসলমান কেউই এমনকী সাদুল্লা সাহেবও চাইতেন না যে, বাঙালিরা বাঙালি হিসেবে আসামে থাকুক।[১৫] ১৯৩৭ সালে জওহরলাল নেহরু যখন আসাম সফরে আসেন তখন 'আসাম সংরক্ষিনী সভা'র পক্ষ থেকে নীলমণি ফুকন ও অম্বিকা গিরি রায় চৌধুরী তাকে স্মারকপত্র দিয়ে দাবি করেছিলেন যে আসামের অসমিয়া এবং হিন্দু চরিত্র যেন বহাল রাখা হয়। রায় চৌধুরী স্বাধীনতা লাভের প্রাক-মুহূর্তে বলেছিলেন— 'Not only Sylhet but its Junior partner Cachar plains also, at any rate Hailakandi Sub-Division should be given to Pakistan.'১৬ বলা বাহুল্য যে গণভোটে শ্রীহট্টের পাকিস্তানভূক্ত হওয়া এই মনোভাবেরই ফলশ্রুতি। কাছাড় অর্থাৎ বর্তমান বরাক উপত্যকা, হাইলাকান্দি সহ আসামে থেকে যাওয়ার দরুনই উগ্র অসমিয়াদের চক্ষুশূল।

স্বাধীনতার পর মুহূর্ত থেকে সরাসরিভাবে বাঙালিও বাংলা ভাষার উপর আগ্রাসন শুরু হয় আসামে। আগ্রাসনের প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া হয় লোক গণনায় মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করে। ১৯৫১ সালের লোক গণনায় ঘটানো হলো বিরাট কারচুপি। অসমিয়া জনসংখ্যা যেখানে ছিল এক তৃতীয়াংশ সেখানে বেড়ে হল ৫৫ শতাংশ আর বাঙালি হল ১৭ শতাংশ। স্বয়ং তৎকালীন সেনসাস কমিশনার ভাগাইওলা একে চিহ্নিত করলেন 'Biological Miracle' বলে।[১৭] এটা সম্ভব হয়েছিল, কারণ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বিশাল সংখ্যক ধর্মীয় সংখ্যালঘু বাঙালির মুখের ভাষা অসমিয়া বলে দেখানো হয়েছিল। এদের বলা হত ন-অসমিয়া অর্থাৎ নয়া অসমিয়া। আর এই সব কাগজের মিরাকলকে বাস্তবে রূপ দিতে ১৯৫১ এবং ১৯৫৪ সালে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সংঘটিত হল ব্যাপক 'বঙাল খেদা আন্দোলন'। ১৯৬০ সালে আবার খেদা-দাঙ্গা আগেরগুলোর চেয়ে আর ব্যাপক ভাষা বিদ্বেষ পৌঁছল চূড়ান্ত পর্যায়ে। লক্ষ লক্ষ বাঙালি দাঙ্গার বলি হলেন, প্রাণ বাঁচাতে বাঙালি পালাতে লাগল সিলঙে, কাছাড়ে, উত্তরবঙ্গে, কলকাতায়। প্রাণ হারাল অনেকে, পুড়ল গ্রামের পর গ্রাম, নষ্ট হল ধন সম্পদ, মান সম্ভ্রম। উগ্র ভাষা প্রেমিকেরা ঘোষণা করল অবিলম্বে অসমিয়াকে রাজ্য ভাষা না করলে সমূহ বিপদ সম্ভাব্য।[১৮]

আসামের বিভিন্ন ভাষাভাষী অনসমিয়া জনগণ সম্মিলিত ভাবে আবেদন জানাল কেন্দ্রের কাছে ভাষার প্রশ্নে স্থিতাবস্থা রক্ষার জন্য, প্রতিবাদ হল আসাম বিধান সভায়, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় উত্তেজনা। কিন্তু কাজ হল না কিছুতেই, অনসমিয়া জনগণের প্রবল আপত্তিকে উপেক্ষা করে আসাম বিধানসভায় ১৯৬০ এর ১০ অক্টোবর পাস হয়ে গেল রাজ্যভাষা বিল— আসামের একমাত্র সরকারি ভাষা হল অসমিয়া।[১৯]

আসামে সাধারণ অসমিয়া জনগণের মধ্যে এবং বাইরে অন্য রাজ্যে, এখন একটা প্রচার আছে যে বাঙালিরা আসামে বহিরাগত, দেশভাগের পর উদ্বাস্তু হয়ে এসে অসমিয়া জাতি এবং ভাষাকে বিপন্ন করে তুলেছে।[২০] এখানে প্রশ্ন জাগে যে যদি সত্য হয়? তবে ব্রিটিশ ভারতের শেষ লোক গণনায় আসামে বাঙালি কীভাবে একক

সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষাভাষী হিসেবে চিহ্নিত হয়, দেশ বিভাগে শ্রীহট্টের অধিকাংশ পকিস্তানে চলে গেলে ও আসামে বাঙালি ও অসমিয়া সমান সমান থাকে কী করে? সত্য হল, বাঙালিরা আসামে বহিরাগতও নন, বিদেশিও নন। আসামবাসী বিভিন্ন জাতি-উপজাতির। আমরা আগে দেখেছি, অসমিয়াদের মতো বাঙালিরাও আসামের স্থায়ী বাসিন্দা এবং তা বাঙালি জাতির এবং অসমিয়া জাতির জন্মের কাল থেকেই। যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

অসমিয়া ভাষা, রাজ্য ভাষা হিসাবে বিল পাস হওয়ার পরে বাঙালি এবং অনসমিয়া পাহাড়ি জাতি-উপজাতি সম্মিলিত ভাবে সভা সমিতি মিছিল মিটিং করে, বিধানসভার বাইরে ও ভিতরে প্রতিবাদ জানালেন, বহু আবেদন নিবেদন জানালেন, বার বার দিল্লির দরবারে যাওয়া হল। কিন্তু সর্ব ব্যর্থ প্রমাণিত হল। আসলে গণ আন্দোলন ছাড়া বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় গণদাবি আদায়ের জন্য কোনো পন্থা নেই। তাই একসময় স্বাভাবিক ভাবেই বঙ্গবাসী কাছাড় জেলায় (অবিভক্ত) শুরু হল মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার তীব্র সংগ্রাম। ওই প্রস্তুতি অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন, দিলীপ কান্তি লস্কর তার 'উনিশে মে'র ইতিহাস' গ্রন্থে— ''কাছাড়ের ঘরে ঘরে দুন্দুভি বেজে উঠল... নববর্ষের শুভদিনে সমগ্র কাছাড় শপথ নিল— জান দেব, জবান দেব না। ...বুকের রক্তে স্বাক্ষর করে সত্যাগ্রহীরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। দলে দলে বেরিয়ে পড়ল পদযাত্রী। গ্রাম থেকে তারা গ্রামে যায়, আর গান গায়— 'মোদের গরব মোদের মোদের আশা আ-মরি বাংলা ভাষা'। তারা ডেকে বলে 'ভাই সব, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও, লড়াই-এর দিন এসে গেছে, অহিংস উপায়ে লড়াই।' মাঠের হাল ছেড়ে ছুটে আসে চাষী, মাছ শিকার বন্ধ রেখে এগিয়ে আসে জেলে, তাঁতী তাঁত বোনা বন্ধ রাখে, ইস্কুল কলেজের ছেলে মেয়ে আসন্ন আন্দোলনের আবেগে কাঁপে। বড়থল, দেওয়ান, দার্বি, আয়নাখাল, সকল চা বাগান, শ্রীগৌরী, মাছলি, কায়স্থগ্রাম, উধারবন্দ, বদরপুর, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ শিলচর সকল শহরে বিপুল উত্তেজনা। একেই বোধহয় বলে গণ অভ্যুত্থান।''[২১]

সত্যিই, সেই গণ অভুত্থানে প্রতিটি অঞ্চলে সংগ্রাম পরিষদের শাখায় শাখায় হাজারে হাজারে সত্যাগ্রহী নাম লেখায়। এই বিপুল উন্মাদনার মধ্যে ঘোষিত হয় ১৯৬১র ১৯শে মে থেকে শুরু হবে জেলা ব্যাপি অহিংস সত্যাগ্রহ। চলবে হরতাল, পিকেটিং। সরকারের পক্ষে এ আয়োজনের ত্রুটি ছিল না। সারা জেলায় ছেয়ে ছিল বন্দুকধারীর দল, মিলিটারি গাড়ি। সর্বত্র যুদ্ধের সাজ। সংগ্রাম পরিষদের প্রথম সারির বহু নেতা বন্দি হলেন জেলে। আত্মগোপন করে সত্যাগ্রহীদের পরিচালিত করতে লাগলেন অন্যরা। এই পরিস্থিতিতে ১৯শে মে সূর্য ওঠার আগে থেকেই কেন্দ্রে কেন্দ্রে উপস্থিত হলেন সত্যাগ্রহীরা, শুরু হয়ে গেল হরতাল। ভোর ছ'টায় শিলচর রেল স্টেশনে অহিংস সত্যাগ্রহীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সেনাবাহিনী, লাগাতার লাঠিচার্জ, কাঁদুনে গ্যাস, অবর্ণনীয় অত্যাচার আরম্ভ হল, সত্যাগ্রহীরা তবু রেললাইন ছাড়লেন না, বন্ধ রইল রেলের চাকা। একই দৃশ্য করিমগঞ্জে রেল স্টেশন ও হাইলাকান্দিতে। হাজার হাজার জনতা পুলিশ তাণ্ডব তাদের থামাতে পারে না। লাঠি চার্জের পর দলে দলে গ্রেফতার, জেলে ঠাঁই হয় না, পুলিশের গাড়ি সত্যাগ্রহীদের নিয়ে দূরে গ্রামে ছেড়ে আসে। পিছু পিছু সংগ্রাম পরিষদের গাড়ি তাদের ফিরিয়ে আনে সংগ্রামের স্থলে। এক সময় পুলিশ হাল ছাড়ে, মনে হয় প্রথম দিনের সংগ্রাম সার্থক। কিন্তু সরকার থামবার নয়, প্রায় বেলা আড়াইটায় অতর্কিতে, বিনা প্ররোচনায়, রেল স্টেশনের বাইরে একটি তুচ্ছ ঘটনার সূত্রধরে শিলচর রেল স্টেশনে অহিংস সত্যাগ্রহীদের উপর এলোপাথাড়ি গুলি চালায় পুলিশ বাহিনী। রক্তে রাঙা হয়ে ওঠে শিলচর রেল স্টেশন। স্বাধীন ভারতের মাতৃভাষা আন্দোলনের প্রথম বলি- ১৯শে মে'র অমর একাদশ শহিদ— কমলা ভট্টাচার্য্য, কুমুদ রঞ্জন দাস, সুকোমল পুরকায়স্থ, হিতেশ বিশ্বাস, বীরেন্দ্র সূত্রধর, তরণী দেবনাথ, কানাইলাল নিয়োগী, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, সুনীল সরকার, শচীন্দ্র পাল ও সত্যেন্দ্র দেব। তাছাড়া তিন শহর মিলে আহতের সংখ্যা ছিল শত শত। শোকে কাতর সমস্ত শহর, সারা জেলা, সারা আসামের জনগণ। মৃত্যু তবু ভাঙতে পারেনি বরাকের মানুষের

মনোবল। যেন শহিদদের নেতৃত্বেই কাছাড়ে চালু থাকে লাগাতার সংগ্রাম, দীর্ঘদিন কোর্ট কাছারি অফিস আদালত দখল করে বসেন কাছাড়ের জনগণ। যে সব দিনের ইতিহাস ধরা আছে ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা পরিতোষ পাল চৌধুরীরর 'রক্তাঞ্জলি' গ্রন্থে, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক সুবীর করের 'বরাক উপত্যকা ভাষা সংগ্রামের ইতিহাস' গ্রন্থে, কবি ডা: দিলীপ কান্তি লস্কর সম্পাদিত সাত খণ্ডে প্রকাশিত 'ভারতে বাংলা ভাষা সংগ্রাম গ্রন্থমালা'য়, কানু আইচের 'ভারতের বাংলা ভাষা সংগ্রাম' গ্রন্থে এবং আরও অনেকের লেখায় বই এবং সংবাদপত্রে। ১৯শে মে'র গুলি চালনার বিরুদ্ধে হরতাল পালিত হয় শিলঙে, খাসি বাঙালির বিশাল মিছিল আসামের রাজধানীর জনজীবন স্তব্ধ করে দেয়। প্রতিবাদে আন্দোলন হয় কলকাতায়ও। যেখানে বাঙালি সেখানেই প্রতিবাদ, মিছিল আর ধিক্কার। অবশেষে এই সংগ্রামের জেরে আসাম বিধানসভায় গৃহীত হয় সংশোধিত ভাষা আইন। কাছাড় জেলার (অবিভক্ত) জন্য বাংলা ভাষার স্বীকৃতিতে আপাত যবনিকা পড়ে ভাষা আন্দোলনের। আসামে থাকল দুই স্বীকৃত সরকারী ভাষা। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার জন্য অসমিয়া, বরাক উপত্যকার জন্য বাংলা, যোগাযোগের ভাষা ইংরেজি।[২২]

তবে আগ্রাসনের সমাপ্তি হয়নি। ভিতরে ভিতরে আগ্রাসনকারী উপায় খুঁজতে থাকে এবং তা বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৭২ সালে। সেই সময় তদানীন্তন সরকার গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে চাইল সারা আসামের কলেজের লেখাপড়ার একমাত্র মাধ্যম হিসেবে অসমিয়া, তারপর ১৯৮৬ সালে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশে স্কুলে স্কুলে অসমিয়া মাধ্যম। দু'বারই গণ আন্দোলন হল বরাকে। করিমগঞ্জ শহরে দু'দফায় শহিদ হলেন তিনজন— বাচ্চু চক্রবর্তী, দিব্যেন্দু দাস ও জগন্ময় দেব। ফলে থেমে গেল অসমিয়া ভাষার আগ্রাসী রথ। পরাজিত সরকার এবার নতুন কৌশল নিল। আসামকে একভাষী করার বাসনা তাদের এত তীব্র যে একের পর এক পদ্ধতি বদল করে। আর বাঙালি গড়ে তুলেছে একের পর এক প্রতিরোধ।

১৯শে মে'র আন্দোলন কাছাড়ে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি আদায় করল। কারণ কাছাড়েই (অবিভক্ত) হয়েছিল গণ-অভ্যুত্থান। পাহাড়ের মানুষ পেল না কিছু। তাই শুরু হল তাদের আন্দোলন। আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আন্দোলন। আসাম ভেঙে সৃষ্টি হল একাধিক পাহাড়ি রাজ্য— মুক্ত হলেন তারা অসমিয়া আগ্রাসন থেকে। বাঙালিরা রইল আসামেই, রইল তাদের সংগ্রামও।

১৯৮৬ সালের পর থেকে সরকার অসমিয়াকরণের পন্থা বদল করে। আইন প্রণয়নের পথ ছেড়ে দিয়ে চোরাগোপ্তা পথে বাংলা পাঠ্যপুস্তকে, প্রশ্নপত্রে, সরকারি নির্দেশনামায় শুরু করল ব্যাপক বাংলা ভাষা বিকৃতি। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যাপক বেকারি, উপার্জনহীনতা, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা এবং দুর্নীতিকে আশ্রয় করে এক শ্রেণির বাঙালির সহায়তায় তারা আসামের বাঙালির মুখের ভাষাকে বদলে দেওয়ার অলিখিত কর্মসূচি গ্রহণ করল। বাংলা পাঠ্যপুস্তকে অসমিয়া কাব্যগঠন পদ্ধতি অনুসরণ, বাংলা বাক্যে যেমন খুশি অসমিয়া শব্দের ব্যবহার করে এমন এক মিশ্র ভাষার জন্ম দিতে সচেষ্ট হল যাকে আর বাংলা বলে চেনা যায় না। সর্বশিক্ষার পুস্তক গুলিতে এই ভাষা প্রদূষণ চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। তাছাড়া বাংলা পাঠ্যপুস্তকে কিছু অসমিয়া পাঠও ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তারপরও ভাষা আইন লঙ্ঘন করে সরকার বরাক উপত্যকায় কিছু কিছু প্রচার পত্র, নির্দেশনামা ইত্যাদি অসমিয়া ভাষায় পাঠিয়ে চলেছে।

সরকারি ক্ষমতা ও অর্থ কাজে লাগিয়ে সাম্প্রদায়িক— শক্তি বাঙালিদের মধ্যে নিজস্ব লোক নিয়োগ করছে যারা ব্যক্তিস্বার্থে করতে পারে না এমন অপকর্ম নেই। আসামের বাঙালিকেও আজকার বিভিন্ন জায়গায় লেখা হচ্ছে বঙ্গভাষী অসমিয়া।[২৩] অসমিয়া এবং আসামবাসী শব্দকে একার্থক করার চেষ্টা চলছে। দার্জিলিং-এর গোর্খাদের কি নেপালিভাষী বাঙালি বলা যাবে কিংবা তামিলনাড়ুর বাঙালিকে বঙ্গভাষী তামিল? আসামে কিন্তু সে রকমই হচ্ছে। আসামে বলা হয় বঙ্গভাষী আসামী। বরাকের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক স্তরে সরকার যে পাঠ্যপুস্তক তৈরি করে 'আদর্শ শিশুপাঠ', তা কিন্তু

বাংলা সাহিত্যের সাহিত্যিকদের দ্বারা রচিত হয় না সকল সময়ে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলদের মতো বড়োমাপের সাহিত্যিকদের স্থান নগণ্য। তাদের স্থানে বসে আছেন কোনো সাহিত্যের অধ্যাপক কিংবা শিক্ষক। ফলে বরাকের শিশুদের ভাষা শিক্ষা শুরু হয় সুরেশচন্দ্র, অনাদি চক্রবর্তীর 'আদর্শ শিশুপাঠ' দিয়ে।[২৪] তার জন্য হয়তো পরবর্তীতে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে জন্ম দিতে পারে বাংলা সাহিত্যে শিশু সাহিত্যের অভাব। পাঠ্য পুস্তক পাঠে এমন ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সরকার কর্তৃক এসব করার কারণ কী? এটা কী বাংলা ভাষাকে দখল করা চোরাপথ, নাকি বিকৃত করার পদ্ধতি? সে যাই হোক এবার স্কুলপাঠ্য বই থেকে কোনো ভালো রচনা পড়ার সুযোগ পায় না এটা নিশ্চিত করে বলা যায়। যাদের লেখক কবি হওয়ার কোনো উপায় নেই, তারা সরকারের দুষ্ট বুদ্ধির সহায়তায় সকলেই শিশুদের কাছে লেখক-কবি সেজে বসে আছেন। এসব বই পড়ে শিশুরা কোনো ভালো বাক্য গঠন পর্যন্ত শিখতে পারে না। বলা বাহুল্য, এইসব পুস্তক প্রণেতারা যদি নিজেদের লেখক হওয়ার বাসনা ত্যাগ করে, বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ রচনা থেকে শিশুদের উপযুক্ত রচনা সংগ্রহ করে সংকলন করে দিতেন তা হলে তাদেরও খ্যাতি বাড়ত, উপকৃত হত বরাকের বাঙালি শিশুরা। সবচেয়ে গূঢ় সমস্যা হয় তখনই যখন কোনো বিখ্যাত বাংলা কবিতাকে কিঞ্চিৎ এদিক-ওদিক পরিবর্তন করে নিজের নামে চালিয়ে দেন লেখক। যেমন নজরুলের বিখ্যাত কবিতা—

"ভোর হলো
দোর খোল
খুকুমণি ওঠরে
ঐ ডাকে
জুঁই-শাখে
ফুল খুকী ছোটরে

খুকুমণি ওঠরে।

রবি মামা

দেয় হামা

গায়ে রাঙা জামা ঐ

দারোয়ান

গায় গান

—শোন ঐ রামা হই।"[২৪]

এই সুন্দর কবিতাটি সরাসরি পাঠ্যপুস্তকে লিপিবদ্ধ না করে ঐ কবিতাটিকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে পাঠ্য পুস্তক প্রণেতা নিজের নামে কবিতা লিখলেন—

"ভোর হল চোখ খোল

খুকুমণি ওঠরে

আকাশেতে রবি ওঠে

ফুল ফুটে বনে রে।"[২৫]

(ভোরের গান, আদর্শ শিশুপাঠ ১ম ভাগ ১৯৮৬)

তাছাড়া রয়েছে অনূদিত পাঠ্যপুস্তক। সাহিত্যের পাঠ্যপুস্তক পরে বাংলা ভাষায় লেখা অন্য যে সব বই ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠ্য হিসেবে পায় তার অধিকাংশই অসমিয়া থেকে অনুবাদ হত। এই অনুবাদ গ্রন্থগুলি ভয়ানক। অনুবাদকের প্রত্যেকেই বাঙালি থাকা সত্ত্বেও কোনো অজ্ঞাত কারণে বাংলা অনুবাদের মধ্যে কিছু কিছু অসমিয়া শব্দ ঢুকিয়ে দেন। শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে অসমিয়া ভাষার বাক্য গঠন পদ্ধতি অনুসরণ করে এক নতুন ধরনের বাক্য গঠন করা হয়। ফলে শুরু থেকেই বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখলে অনেকেরই মনে হতে পারে এই ত্রুটিগুলি নিতান্তই অনুবাদকের এবং অনিচ্ছাকৃত। কিন্তু একটু খেয়াল করলেই ধরা পড়বে এসব ইচ্ছাকৃত ও পরিকল্পিত। কোনো ব্যক্তি বিশেষের ভুল নয়— বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে একই ভুল করে চলেছেন।[২৬]

১৯৪৭ সালের পর থেকেই আসামে বাঙালি এবং বাংলা ভাষার উপর আক্রমণ সরাসরি এবং বেসরকারি উদ্যোগে প্রায় নিয়মিত চলছে। আসামের বাঙালি সমাজ তাদের বহু অমূল্য প্রাণের বিনিময়েও যখন উগ্র জাতীয়তাবাদী হিংস্র আন্দোলনের প্রতিরোধে তৎপর তখন দেখা যায় আক্রমণকারী তাদের আক্রমণের পদ্ধতি ক্রমশ পরিবর্তন করে চলেছে। যেমন ১৯৫১ সালের 'বঙাল খেদা' বর্তমানে 'বিদেশি বিতাড়ন' নাম ধরে সর্বভারতীয় স্বীকৃতি আদায় করে নেয়।[২৭]

অসমিয়া ভাষা হবে রাজ্যের সরকারি কাজকর্মের একমাত্র ভাষা, ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা পড়ার একমাত্র মাধ্যম[২৮]— এইসব প্রত্যক্ষ আক্রমণ যখন বরাক উপত্যকার জনগণের প্রতিরোধ আন্দোলনে সম্পূর্ণ সার্থক হতে পারছে না— তখন আক্রমণকারীরা পন্থা পরিবর্তন করতে মনস্থ করে। প্রত্যক্ষ আক্রমণের পাশাপাশি চেষ্টা শুরু হয় আসামের বাঙালির মাতৃভাষা শিক্ষাকেই বিকৃত করে দেওয়ার। এটা খুব স্পষ্ট। আসামের অনেক দালাল শ্রেণির রাজনীতিবিদ গোপনে গোপনে কখনও কখনও প্রচার করার চেষ্টা করেছেন যে বরাক উপত্যকার মানুষের মুখের ভাষা বাংলা নয়। অসমিয়া ভাষারই একটা উপভাষা মাত্র। যা আমরা পূর্বে বলেছি। সমস্ত ভাষাবিদদের সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে সহজ সরল অসমিয়া সমাজে তাদের এই প্রচার নিয়মিত চলে আসছে। বাংলার যে উপভাষায় এ অঞ্চলের মানুষ কথা বলেন লিখিত বাংলা ভাষার সাধারণ রূপ থেকে তার দূরত্বটুকু আসলে ওরা কাজে লাগাতে চায়। এই পরিকল্পনাটা আর সার্থক হবে যদি এ অঞ্চলের মানুষের লেখাপড়ার ভাষাটাকেও বিকৃত করে দেওয়া যায়, যদি কিছু কিছু আঞ্চলিক বাংলা শব্দ ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, যদি তাতে প্রচুর অসমিয়া শব্দ ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, যদি তার বাক্যগঠন পদ্ধতি করা যায় অসমিয়ার অনুরূপ। এসব পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরি হচ্ছে সরকারি প্রকাশনার পাঠ্যপুস্তক, বিভিন্ন পরীক্ষা প্রশ্নপত্র প্রভৃতি। এসব পরিকল্পনা সার্থক করার উদ্দেশ্যে তারা কাজে লাগাচ্ছেন কিছু শিক্ষিত বাঙালিদেরই। এসব বাঙালিরা নানা অসৎ লোভে এই চক্রান্তে নিজেদেরও জড়িত

করেছেন।[২৯]

উপরোক্ত আলোচনাটি প্রতীয়মান করার জন্য কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা যায়—

১। প্রশ্নপত্রের বাংলা : বৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্ন

"শোণিতপুর জিলার বিহুগুরি গ্রামের লক্ষ্মীনাথ বরা ১৯৮৫ সনের ডিচেম্বর তারিখ শুক্রবার ২ খানা পাটের চাদর বিক্রয় করিয়া ১৮৮.০০ টাকা ও ধান বিক্রয় করিয়া ৩৬৫.০০ টাকা পান। এই মূলধন দ্বারা সেইদিনই কিলোগ্রাম ৩.২০ টাকা দরের ৮০ কিলোগ্রাম চাউল, কিলোগ্রাম ৫.৫০ টাকা করে ১৫ কিলোগ্রাম চিনি, কিলোগ্রাম ৬.৫০ টাকা দরে ৫ কিলোগ্রাম ডাইল, কিলোগ্রাম ১.২০ টাকা দরে ১ কুইণ্টল লবণ, কিলোগ্রাম ৩৯ টাকা দরে ৫০০ গ্রাম চাপাতা, প্রতিটি দিয়াশলাই .২৫ প.সা করে ২ জন দিয়াশলাই কিনিলেন।" —এই প্রশ্নপত্রটি - প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার। (১৯৮৬)[৩০]

২। বৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্ন : ১৯৭৪

ক) আসামের চিড়িয়াখানা থাকা স্থানের নাম।

খ) আসামের সার কারখানা থাকা স্থানের নাম।

গ) আসামের চিনিকল থাকা স্থানের নাম।

ঘ) আসামের পাঠকল থাকা স্থানের নাম।[৩২]

৩। বৃত্তি পরক্ষীর প্রশ্ন - ১৯৭৯-৮০

ক) আসামের চিনিকল থাকা একটি স্থানের নাম।

খ) জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পাওয়া আসামের সাহিত্যিক জনর নাম।

গ) ভারতের মুরব্বীর নাম লিখ।[৩৩]

এভাবে ১৯৭২ সালের পর থেকে প্রতি বছরই দেখা যাচ্ছে প্রশ্নপত্রের কিছু না কিছু বাক্য গঠন হচ্ছে অসমিয়া ভাষার অনুকরণে। 'ডাইল', 'দিয়াশলাই' ইত্যাদি শব্দও ব্যবহার করা হচ্ছে যা কোনো বাঙালি তাদের লিখিত ভাষায় ব্যবহার করেন না। এবার কিছু উদাহরণ দেওয়া যায় পাঠ্যবই থেকে। (ভূগোল পরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয়

প্রকাশ ১৯৮২)

১। মুদ্রাকর : আর্যপ্রেচ্ছ।

২। প্রশ্নমালা ঃ

"নীচের বাক্যসমূহ বাঁকা আঁচরের মধ্যে কয়েকটি বাক্য আছে। ...সূর্যের সহায়ে ধ্রুবতারার সহায়ে দিকদর্শন যন্ত্রের সহায়ে মানচিত্রের সহায়ে নির্ভুলভাবে আমরা দিক নির্ণয় করতে পারি।"[৩৪]

ষষ্ঠ শ্রেণির 'বিজ্ঞান পাঠ' থেকে আরও কয়েকটি উদাহরই দিই—

ক) দিনে আকাশ পরিষ্কার থাকিলে নিশাকালে শিশির বেশি করিয়া পড়ে।

খ) বহাগ বিহুর সময় এক পশলা শিলা বৃষ্টি হয়।

গ) কোন কোন গোছার শিকড় পাথালিভাবে বাড়িয়াছে— আবার কোন কোন গোছার শিকড় নীচের দিকে গর্তের ভিতরে গিয়াছে। পাথালি করিয়া অভিন্ন দিকে শিকড় বিস্তৃত হইলে মাটি সহজে ভাঙিয়া যায় না।

ঘ) এই রূপ করিতে তুমি বল প্রয়োগ করা নাই কি?

ঙ) কুলগাছে এক প্রকার হলুদ রঙের লতা দেখিয়াছ কি? আকাশিলতা নামে পরিচিত।

চ) একটি বড় জার্মানীপেনার ডাল লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার।[৩৫]

তাছাড়া রয়েছে অগণিত শব্দ যেমন— এছ, প্রেছ, নেচলেন, অফচেট, মেসিন, প্রিন্টার্ছ, আগকথা রঙ্গবদলের, মান দেয়, খোদলটাকে, খোদলে ইত্যাদি। এই ধরনের শব্দ ব্যবহারের অর্থ বাংলাভাষাকে বিকৃত করা ছাড়া আর কিছু নয়।

আবার 'সর্বশিক্ষা' নামে আসাম সরকার যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছে তাতেও রয়েছে বাংলা ভাষাকে বিকৃত করার চেষ্টা। কেননা সর্বশিক্ষার যে বাংলা পাঠ্যপুস্তক রয়েছে সবগুলোই প্রদূষিত। উদাহরণ, স্বরূপ ২০০৯ সালের 'পরিবেশ অধ্যয়ন', 'ভাষা', 'গণিতে'র কথা বলা যায়। উল্লেখিত প্রতিট বইয়ের প্রচ্ছদে লেখা— 'শিকন' পুঁথি।

নীচের দিকে লেখা রয়েছে— আসাম (কোনোটায় অসম) সর্বশিক্ষা অভিযান মিছন কাহিলীপারা, গুয়াহাটী-১৮। শিকন পুথি মানে কী, একথা কোন ভাষায় লেখা? নিশ্চয় বাংলা নয়। পরিবেশ অধ্যয়ন বইটির মুদ্রিত পৃষ্ঠা ১৫-তার অধিকাংশই নানা রকম ছবি। ছবির আশেপাশে সামান্য মুদ্রিত অংশ আছে, তাতে মোট ভুলের সংখ্যা ৫৮টি। গণিত ও ভাষা পুস্তকে সে সংখ্যা আরও বেশি। আর ভুলের নানা রকম রয়েছে। বানান ভুল, ছাপার ভুল, ভাষার ভুল এবং সব কিছুকে ছাপিয়ে বাংলার মধ্যে অসমিয়া শব্দ, হরফ (ব, ব) এবং অসমিয়া বাক্য ও বাক্য গঠন পদ্ধতি ব্যবহার। এছাড়া আছে একই বানান একাধিকভাবে লেখা। এসব ভুলের বাইরে আরও যা বলার হল বইতে যেসব কবিতা ছাপানো হয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদানের জন্য তা দেখে মনে হয় বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে কোনো পরিচয় নেই লেখকের। বাংলা ভাষার বইতে কোনো বাঙালি মনীষীর কথা নেই— বাংলা ভাষা বা সাহিত্যের কোনো উল্লেখযোগ্য লেখকের লেখা কিংবা কথা নেই— আছে অসমিয়া মনীষীর কথা, অসমিয়া সাহিত্যের কথা।[৩৬]

আসামের জাতীয় সংগীত বলে ছাপানো হয়েয়ে অসমিয়া ভাষার একটি কবিতা। বাংলা ভাষার বইয়ে অসমিয়া কবিতা কেন? জাতীয় সংগীত আবার আসামের আলাদা হয় কী করে? এদেশে জাতি একটাই-ভারতীয় এবং ভারতের জাতীয় সংগীত বাংলা ভাষাতেই লেখা— জাতীয় সংগীত ছাপতে হলে তো বাংলা ভাষাতেই ছাপানো যেত।

সে যাই হোক আলোচ্য বই থেকে একটি বিকৃত বাংলা কবিতা তুলে ধরছি—

"শুক্করবারে শুক্রেশ্বরে
ভাত শক্ত দিয়ে খায়
শনিবারে শনিরামে
বাজারতে যায়।"[৩৭]

কবিতাটির পরে বইটিতে একসঙ্গে গাইতে বলা হচ্ছে যে গান তাতে আছে— বৈশাখে বোদের তেজ / ...আষাঢ় শ্রাবন বর্ষাকাল / পূজোর মজা আশ্বিনে / শিশির

ঝারে কার্ত্তিকেতে / ধনে পকে ওই অগ্রানে / ফালগুনের পর ....ইত্যাদি।[৩৮]

কার্য নং ৫এ আছে ঃ এসো শূন্য স্থান পুর করি।

কার্য নং ৬ এ আছে ঃ সেপ্তেম্বর, তাছাড়া জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি শব্দগুলোতে 'ী' ব্যবহার, যা বর্তমানে বাংলায় ব্যবহার করা হয় না। সর্বশিক্ষায় 'র্ব' ব্যবহার হলে ও 'কার্তিক'-এ 'র্ত' ব্যবহার করা হয়েছে।

আরও কিছু বানান এ রকম ঃ ব্যবস্থা, উৎসব। রংয়ের উৎসব, কি কি উৎসব, কে কি করছে, দক্ষিণ, অসুখ হৈতে পারে, কাপোর ধোওয়া, ব্যবহার করা, জীব-জন্তুর, প্রানী ইত্যাদি।[৩৯]

কিছু বাক্য ঃ

১। কলেরা, তেজ হাগা আদি বিভিন্ন বেমার পানীয় জবিয়তে আমার শরীরে প্রবেশ করে।

২। পুকুর, দমকল ... বৃষ্টি ... সাগর.. এগুলিকে জরে উৎসব বলে।

৩। জল আমরা বিভিন্ন কামকাজে ব্যবহার করি।

৪। পিপাসা লাগলে ... জল না হলে কোন প্রাণী জীবিত থাকিবে না।[৪০]

কিছু ভাষা পুস্তকের বাক্য ঃ

১। স্বাধীনতা আন্দোলনে অনেক লোক শ্বহীদদের শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করা উচিত।

২। পড়ো অহি।

৩। খালী ঠাইত কি হবে লিখি।

৪। সীতা বই আনা।

৫। পরশু গধুলিতে হৃদয় কামরূপ যাবে।

৬। শব্দগুলি শিকি।

৭। মৌ মাখিয়ে গান গায় ইত্যাদি।[৪১]

গণিত বই থেকে কয়েকটি উদাহরণ ঃ

১। ভেকুলীর ৪ খন ঠেং, ৬টা ভেকুলীর কেইকন ঠেং হব।

২। পূরণের প্রারম্ভিক ধারণা বুঝে পাওয়া

৩। ৯৯ব ভিতবত সংখ্যার ধাবণ করা বিয়োগ করিবলই শিকা।

৪। একটা ১০ পইচা ও একটা ২৫ মিলে কত পয়সা হবে?

৫। প্রতি দল শিকন কোন থেকে ভটিবার কাটির মুঠো নিয়ে আসবে।

৬। শিকনীয় দিশাসমূহ।[৪২]

তবে ২০১৩ সালের সর্বশিক্ষার বইয়ের অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মৌলিক কোন পরিবর্তন হয়নি, অর্থাৎ ভাষা প্রদূষণের যে ব্যাপক পরিকল্পনা দীর্ঘদিন ধরে কার্যকরী তা অপরিবর্তিত রয়েছে। যে মানসিকতা ২০০৯ সালের বইয়ে ছিল বর্তমান বইতেও সেই মানসিকতা সম্পূর্ণ রয়েছে। শিক্ষিত অনুবাদকেরা বইয়ের মাঝখানটা অনেকটা ঠিক করে দিয়েছেন, কিন্তু সামনের কয়েক পৃষ্ঠায় অসমিয়া মেশানো বাংলা এবং শেষে সেই অসমিয়া ভাষার আসামের 'জাতীয় সংগীত'টি প্রতিটি বাংলা বইতে পূর্ণমর্যাদায় অবস্থিত।[৪৬]

সুতরাং সর্বশিক্ষা থেকে আরম্ভ করে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত রয়েছে সাহিত্যিক তথা ভাষা আগ্রাসনের চিহ্ন। স্কুল পাঠ্য বইয়ের মাধ্যমে, বিভিন্ন বিভাগীয় প্রচার পত্র, নির্দেশিকা ইত্যাদির মাধ্যমে ভাষা আগ্রাসন সরকারের বিশেষ কৌশল ছাড়া আর কিছু নয়।

আবার 'আসাম' নামের পরিবর্তনে রাজ্যের নাম 'অসম' করার যে পরিকল্পনা ও ব্যবস্থার তার মূলেও রয়েছে ভাষা আগ্রাসনের ধারণা। আকস্মিক ভাবে 'আসাম'-এর পরিবর্তনে আসাম লেখার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। যখন কোনোভাবে অর্থাৎ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে আসামকে একভাষিক রাজ্য হিসাবে চিহ্নত করা গেল না তখন সরকার ২০০৬ সালে হঠাৎ আসাম নাম পরিবর্তনের কাজে লেগে যায়। ২০০৬ সালে ২৮ ফেব্রুয়ারি, দৈনিক যুগশঙ্খ পত্রিকায় তার হদিশ পাওয়া যায়— ''গুয়াহাটি ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ আসাম নামটি মুছে গেল।...আজ মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈর পৌরোহিত্যে রাজ্য মন্ত্রীসভার

বৈঠকে অসম সাহিত্য সভার সুপারিশ মতো আসামের নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সাহিত্য সভার প্রাক্তন সভাপতি চন্দ্রপ্রসাদ শইকিয়া আসামের নাম বদলে অসম করার জন্য রাজ্য সরকারকে সুপারিশ করেন, সেই পরামর্শ গ্রহণের কথা সাংবাদিকদের জানান সরকারি মুখপাত্র হিমন্ত বিশ্বশর্মা। আসামের নাম বদলের যৌক্তিকতায় ব্যাখ্যা করে মন্ত্রী শর্মা বলেন, আহোম থেকে আসাম কথাটি এসেছে অসমিয়া জনগোষ্ঠী হিসেবে অসম কথাটির যৌক্তিকতা আছে। ব্রিটিশ নিজেদের সুবিধার্থে অসমকে আসাম হিসাবে নামকরণ করে। কিন্তু পৌরাণিক, রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আসাম প্রকৃতার্থে অসম হিসেবেই বিবেচিত হয়ে আসছে।—একটি রাজ্যের নাম বদলের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিধানসভার অনুমোদন প্রয়োজন, কিন্তু এক্ষেত্রে সরকারি মুখপাত্র হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানান, এসবের কোনও প্রয়োজন নেই।"[৪৪] (পৃ:১)

গবেষণার খাতিরে বলতে হয়, হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এই কথাগুলো আংশিক সত্য। আসলে ব্রিটিশ তাদের সুবিধার্থে আসাম শব্দটি ব্যবহার করে নি। ওরা 'আসাম' উচ্চারণ ঠিকই করেছে। কেননা আসাম আহোমদের দেওয়া নাম। আর তা-ই ব্রিটিশ উচ্চারণ করেছে। অধিকাংশ পণ্ডিত ব্যক্তি আসাম নামের উৎপত্তি সম্পর্কে একমাত্র যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা বলে যা স্বীকার করে নিয়েছেন তা হল এই যে মঙ্গোলীয় জাতির 'শান'-শাখার আহোমগণ এখানে পরিচিত হয়েছিলেন 'শান-শ্যাম' বা 'আ-শ্যাম' হিসেবে। দীর্ঘদিনের ব্যবহারে এই শব্দ সমষ্টি পরবর্তী কালে হয়ে যায় আসাম।[৩৭] কোনো কোনো বড়ো পণ্ডিতের মতে আহোমদের দখলিকৃত উজান আসামকে পশ্চিমের বড়োরা বলত 'হা-শ্যাম', অর্থাৎ শ্যামদের দেশ (বোড়ো ভাষায় হা মানে মাটি কিংবা দেশ)। 'হা-শ্যাম' নামটিই পরবর্তীতে হয়ে হয় আসাম। তাছাড়া ব্রিটিশের আসাম অধিকারের পরবর্তী অর্ধশতাব্দীকাল আসাম নামেই পরিচিত ছিল এই প্রদেশ। সেই সময় অসমিয়া বিদ্বৎ সমাজ সর্বদা আসাম নামটি ব্যবহার করতেন। গুণাভিরাম বরুয়ার লেখা আসামের ইতিহাসের নাম ছিল 'আসাম বুরঞ্জী'। সেই সময়ের বিখ্যাত সাময়িকী এবং সংবাদ

পত্রগুলির নাম ছিল 'আসাম বান্ধব', 'আসাম বিলাসিনী' ইত্যাদি।[৪৫]

অবশ্য আমাদের মধ্যযুগের সাহিত্যে— যথা শংকরদেব আর মাধবদেবের রচনায় 'অসম' শব্দের উল্লেখ আছে। শংকরদেব লিখেছেন 'গারো-নাগা-মিরি-অসম-কছারী এরা কেবল হরিণাম কীর্তন করেই মোক্ষলাভ করতে পারবে।'[৪৬] আসলে এখানে 'অসম' শব্দের দ্বারা আহোমগণকে বুঝানো হয়েছে। হরিণামের এতই মাহাত্ম্য যে অন্যান্য উচ্চবর্ণ দূরের কথা, গারো-নাগা-মিরি-আহোম-কছারী মতো ম্লেচ্ছ জাতির পক্ষে ও হরিনাম কীর্তনে মোক্ষলাভ সম্ভব। তাছাড়া ভাষায় সুপণ্ডিত ইতিহাসবিদ ড. যোগেন্দ্রনাথ ফুকন তার সংগ্রহের আহোম স্বর্গদেউ রাজশ্বের সিংহ, গৌরীনাথ সিংহ প্রভৃতি বিভিন্ন স্বর্গদেউদের স্মৃতি বিজরিত ত্রিশটিরও অধিক তাম্রফলকের অধিকাংশই 'আসাম' শব্দ ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন।[৪৭]

অতএব, বিভিন্ন পত্রিকা যেমন আনন্দবাজার, দৈনিক ষ্টেটম্যান প্রভৃতির মাধ্যমে যে প্রচার শুরু হয়েছিল ২০০৬ সালে তা ভিত্তিহীন। তা আগ্রাসনের নামান্তর বলা যায়। কেননা উগ্র অসমিয়া জাত্যাভিমানীদের আগ্রাসনের ইতিহাস থেকে এটা উপলব্ধি হয় যে আসামের পরিবর্তে অসম হলে, আসাম হবে একভাষী রাজ্য। বাকি যে জনগোষ্ঠী থাকবে তার স্বাবাবিক ভাবে হবে বিদেশী। এই কৌশলটা ছিল ওদের ধারণার মধ্যে। আসাম নামের সঙ্গে কিছুটা হলেও বরাকের বাঙালির জাতীয় অস্তিত্ব, ভাষা এবং সাহিত্য সংস্কৃতি জড়িয়ে আছে। সুতরাং কৃত্রিমভাবে অসম হলে অনায়াসেই বাঙালির সার্বিক অস্তিত্ব সংকটে পড়বে। এই বোধ থেকে বরাকের জনগণ আন্দোলন করছেন কথায়-লেখায় প্রায় প্রতিদিন, বরণ করছেন একের পর এক শহিদের আত্মহুতি।

উল্লেখ্যপঞ্জি

১। কর সুবীব : 'বরাক উপত্যকার ভাষা সংগ্রামের ইতিহাস' প্রকাশক শ্রীমতী রীতা কর, করিমগঞ্জ, প্রথম প্রকাশ

২১, জুলাই ১৯৯৯, পৃ: ১৮।

২। তদেব : পৃ: ১৯।

৩। তদেব : পৃ: ২০।

৪। তদেব : পৃ: ২২।

৫। লস্কর কান্তি দিলীপ : 'আসামে বাংলা ভাষার সংকট', প্রকাশক শ্যামলী লস্কর, কৈলাশহর, ত্রিপুরা, প্রথম প্রকাশ-২০০৩, পৃ: ১৪।

৬। তদেব : পৃ: ১৫।

৭। তদেব : পৃ: ১৫।

৮। তদেব : পৃ: ১৭।

৯। তদেব : পৃ: ১৮।

১০। তদেব : পৃ: ১৮।

১১। তদেব : পৃ: ২০।

১২। রায় অলক : 'ভাষা সংগ্রামে কাছাড়', প্রকাশক রূপা রায়, নীলমনি রোড, করিমগঞ্জ, প্রথম প্রকাশ ১৭ আগস্ট, ১৯৭৩, পৃ: ১৩।

১৩। তদেব : পৃ: ১৩।

১৪। তদেব : পৃ: ১৫।

১৫। তদেব : পৃ: ১৬।

১৬। তদেব : পৃ: ১৬।

১৭। তদেব : পৃ: ১৮।

১৮। লস্কর কান্তি দিলীপ : 'উনিশে মের ইতিহাস', প্রকাশ শ্যামলী লস্কর, উত্তর ত্রিপুরা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং ওয়ার্কস,

কৈলাশহর, প্রথম প্রকাশ ২০০২, পৃ: ১২।

১৯। তদেব : পৃ: ২৪।

২০। তদেব : পৃ: ২৪।

২১। তদেব : পৃ: ২৮।

২২। তদেব : পৃ: ৩১।

২৩। তদেব : পৃ: ৩১।

২৪। চৌধুরী কুমার সনৎ : '১৯শের স্মৃতিকথা', ইণ্ডিয়া প্রেস, শিলচর, প্রথম প্রকাশ-২০১১, পৃ:১১।

২৫। তদেব : পৃ: ১১।

২৬। তদেব : পৃ: ২২।

২৭। তদেব : পৃ: ২৩।

২৮। বিশ্বাস অনুরূপা : 'উনিশে মে আয়ুষ্মান হও', বরাক নন্দিনী প্রকাশনী, অম্বিকাপট্টি, শিলচর, ৭৮৮০০৪, প্রথম প্রকাশ, ১৯শে মে ১৯৯৪, পৃ: ৪১।

২৯। ভট্টাচার্য কুমার বিজিৎ : '১৯শে মে এবং আসামে বাঙালির অস্তিত্বের সংকট', প্রকাশক শিখা ভট্টাচার্য, সাহিত্য প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ-২০০৯।

৩০। তদেব : পৃ: ১৭।

৩১। তদেব : পৃ: ১৭।

৩২। তদেব : পৃ: ১৭।

৩৩। তদেব : পৃ: ১৭-১৮।

৩৪। তদেব : পৃ: ১৮।

৩৫। তদেব : পৃ: ১৯।

৩৬। তদেব : পৃ: ২০।

৩৭। তদেব : পৃ: ২৪।

৩৮। তদেব : পৃ: ২৫।

৩৯। তদেব : পৃ: ২৫।

৪০। তদেব : পৃ: ২৫-২৬।

৪১। তদেব : পৃ: ২৬।

৪২। তদেব : পৃ: ২৭।

৪৩। তদেব : পৃ: ২৬-২৭।

৪৪। তদেব : পৃ: ২৭।

৪৫। তদেব : পৃ: ৩০।

৪৬। তদেব : পৃ: ৩৩।

৪৭। তদেব : পৃ: ৩১।